সীমান্ত কথা - ১

মখদুম আজম মাশরাফী

জন্মেছিলাম বাংলার মাটিতে। সময়টি ছিল দেশ বিভাজনের প্রথম দশকের শেষে। বুঝতে শিখেই জেনেছি যুগ যুগান্তরের ভারত বর্ষ তখনই খন্ডিত। পূর্বে ও পশ্চিমে পাকিস্তান, মধ্য ভাগে ভারত। কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বাংলার বুক চিরে আঁকা চিহ্নিত বিভক্তির সীমান্ত রেখা।

আমার প্রকৃত জন্মস্থান যে লোকালয়টিতে তা ছিল সীমান্তরেখার বেশ কাছাকাছি রামনগর এ। দিনাজপুর জেলা শহরের একটি এলাকা-উত্তর প্রান্তের শহরতলী। এখান থেকে মাত্র ৫ মাইলের মধ্যে হল জেলার শেষ রেল স্টেশন 'বিরল'। আমার আব্বা ছিলেন কোতয়ালী থানার কর্মকর্তা তখন। থানা আবাসের একটি গৃহে আমার জন্ম আব্বা আম্মার স্নেহবৎসল সংসারে এনেছিল আনন্দের প্রবাহ। সে বয়সের স্মৃতি স্মরণে থাকে না কারুরও। কিন্তু লাল ইটের থানা বিল্ডিং ও সেই কম্পাউন্ডের বাসাগুলি বহুবার দেখেছি শিশুবেলায়। ঘেরার বাইরে প্রধান সড়কের ওপারেই ছিল একটি প্রকান্ড বটগাছ। গোড়াটিছিল তার শান বাধানো। তারই একধারে ছোট্ট টিনের চালা ঘরে ছিল সু:স্বাদু চানাচুরের দোকান। ঈষত স্বচ্ছ তেল-কাগজের তৈরী মিনি বস্তায় (তিন ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চি) বিক্রি হত সেই চানাচুর। বেগুনী সিল মোহরে বস্তার গায়ে লেখা থাকতো 'গিরিধারী চানাচুর'।

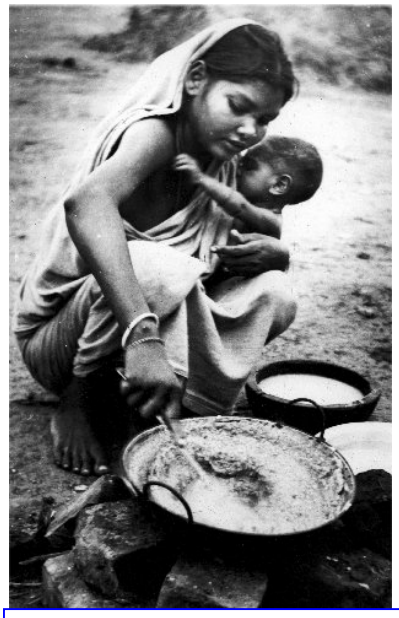

১৯৬৯, সব হারিয়ে ওপাড়ে ভারতের মাটিতে বাংলাদেশী শরর্নাথী এক মা

দিনাজপুর জেলাও জেনেছি খন্ডনের কাটাদাগ বুকে করে বেঁচে আছে। পশ্চিম দিনাজপুর নামে প্রায় অর্ধেক দিনাজপুর জেলা পড়েছে পশ্চিম বাংলার ভাগে। সীমান্ত রেখার কোন দেয়াল নেই। দেয়ালেরও বুকে দরজা থাকে। কিন্তু সীমান্তের নেই কোন জানালা দরজা। ছোট বেলায় মনে হত সীমান্তে এসে বুঝি শেষ হয়ে গেছে জগৎ সংসার। রেখার ওপারে যেন অজানা অন্ধকার অথবা চোখ ধাঁধাঁনো দুর্বোধ্য আলো। দিনাজপুর শহরে কেটেছে আমার প্রারম্ভ শৈশব। স্টেশনটি শহরের দক্ষিন প্রান্তে। তারপর রেল লাইন। তার ওপারে বসতি ও লোকালয় কোর্ট কাচারী ও পুলিশ লাইন। স্টেশনের পরেই ছিল প্রকান্ড এক মাঠ। মাঠের আর তিন দিকে ছিল জেলা বোর্ডের সড়ক। পরে অবশ্য আমরা থাকতাম এই মাঠের পশ্চিম দিকের সড়ক পার হয়েই একটি বাড়ীতে। আব্বার কাছেই জেনেছি এই বাড়ীটি 'শত্রু সম্পত্তি'। না এটি আব্বার দেয়া কোন নাম নয়। অফিসিয়ালী পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বলা হত 'এবান্ডন্ড প্রপার্টি ' আর 'এনিমি প্রপার্টি '। আমার সেকালের কচি মনে ঐ অজানা শত্রুদের সম্পর্কে ছিল অনেক কৌতুহল। আবার কখনও ভেবেছি এবান্ডন্ড বা পরিত্যক্ত? সে ছোট্ট মনে ভেবেছি আহা কি বাধ্য বাধকতা ছিল ওদের যে ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করে ছেলে সংসার নিয়ে চলে গেছে সীমান্ত পেরিয়ে সে অজানা অন্ধকার বা ধাঁধানো আলোর দেশে। ওরা কি কোন রাজবাড়ী বা প্রাসাদের আকর্ষনে ফেলে গেছে এসব অবহেলায়।

ছেলের এসব কল্পনা প্রসুত অজস্র প্রশ্নের বৃষ্টিতে নেয়ে উঠতে উঠতে আম্মা-আব্বার মন কখনও কোন অতীত স্মৃতির মেঘে চড়ে উদাস হয়ে যেতো কিনা তা লক্ষ্য করার বয়স আমার তখন ছিল না।

আমাদের ঐ শত্রুবাড়ীটিকে কল্পলোকে মনে হত এক গুপ্ত ইতিহাস। কখনও কান পাতলে শুনতে পেতাম মানুষের দৈনন্দিন চলাফেরার পদশব্দ। কখনও বা কথা হাসির শব্দ। কুয়ো তলার জলের শব্দ আমাকে হঠাৎ সচকিত করতো কখনও বা। যেন আমি চলেছি টাইম মেশিনে চেপে কোন এক অজানা সুদুর অতীতে। তারপর আবার মিলিয়ে যেতো ঐ কল্পপুরীর মানুষগুলি। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেতাম না ওরা কেন শত্রু হলো আমাদের। কেনই বা ওরা একদিন এই প্রিয় সুখনীড় ছেড়ে চলে গেল অজানা ীপারে।

জন্ম থেকে প্রারম্ভ শৈশব কেটেছে আমার ঐ খন্ডিত জেলা শহরে। ঐ শহরের পরতে পরতে আছে সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া এককালের আধীবাসীদের স্পর্শ, কর্ম ও স্মৃতি। ঐ শহরের অনেক গৃহস্থ গৃহস্বামীরাও ফেলে এসেছেন তাদের জীবনের স্মৃতি, সম্পদ ও অতীত ওপারের গৃহকোনে, পথে-প্রান্তরে আর একদা বন্ধুজনের নিভৃত মনের প্রিয় কোনে। যারা এসেছেন তাদের অনেকে করেছেন বসতি ও ভুমি বিনিময়, যারা গেছেন তাদের সাথে। এরা তাই বেঁচে আছেন এক মিশ্র অনুভবের বিবমিষার পরিবেশে। যেখানে ঘরের দরজায়, কড়িকাঠে আছে অন্যজনের উপস্থিতির স্মৃতিগন্ধের আহাকার। আবার বুকে করে আছেন ফেলে আসা পরিবেশের ভারাক্রান্ত স্মৃতি সৌরভ। আবার যাদের স্বজন হয়েছে দাঙ্গার শিকার তাদের বুকের মধ্যে প্রিয়জন হারানোর যে শূন্য স্থান তাতে শুধু বাজে কান্নার সুর।

দিনাজপুরে আছে বিখ্যাত রাজবাড়ী। রাজা-রাণী বা রাজকন্যাহীন সে বিশাল বাড়ীতে দেয়ালে দেয়ালে আছে দীর্ঘশ্বাসের বাতাস। আরও আছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। বিদ্যানুরাগী সেই মানুষটির নাম সশ্রদ্ধ উচ্চারণে পাকিস্তান আমলেও অনেকদিন পর্য্যন্ত বেচে ছিল।কোন এক অজানা কারণে সে নাম একদিন মিলিয়ে গেল অতীতের গর্ভে। যদিও দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম এখনও রয়ে গেছে ইংরেজ ব্যক্তিদের নামে। রংপুর এর বিখ্যাত কারমাইকেল কলেজ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ, ঢাকার কার্জন হল, ইত্যাদি যেগুলো কোন ব্যক্তি অনুদানে গড়ে না উঠলেও সে নাম বেঁচে আছে।

ভারতীয় সীমান্ত প্রহরী ও জাত-ধর্ম নির্বিশেষে অগনিত বাংলাদেশী শরনার্থী, ১৯৭১,

দিনাজপুরের অদূরে আছে বিখ্যাত কান্তজীর মন্দির। পোড়া মাটির কারুকাজে এ মন্দিরের ছাদ ও দেয়ালে দেয়ালে সম্পূর্ন রামায়নের ঘটনাবলীর শিল্প শৈলী শুধু আধ্যাত্ব-সাধনার ভারত ভূমির সমন্বিত অতীতের কথাই স্বরন করিয়ে দেয় না বরং এই ভুমি সংলগ্ন হাজার বছরের বহুমুখী আধ্যাত্ব চর্চার জনগোষ্ঠির শান্তিময় জীবনের কথাই বিমূর্ত্ত করে রাখে।

আব্বার চাকুরী থেকে অবসরের সময় ঘনিয়ে এলে অনেকে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আমাদের 'শত্রু বাড়ীটিকে' কাগজে নিজের করে নিতে। আমাদের ভাইবোনের বেশ বড় ঐ পরিবারটিকে নিয়ে আমার আব্বা নির্বিকার মনে ছেড়ে এসেছিলেন সেই বাড়ীটি। আব্বার ঐ ন্যায্য সিদ্ধান্তের জন্যে আমি তাকে চিরকাল ধন্য চিত্তে শ্রদ্ধা করেছি। আমরা ফিরে গিয়েছিলাম আব্বার পৈত্রিক নিবাস আরেক সীমান্তবর্তী, ডোমারের নিজ ভিটে মাটিতে।

যেখানে শুরু হয়েছিল আমার জীবনের আরেক সীমান্ত ঘেষা লোকালয়ের স্মৃতি-মায়া-গন্ধময় শৈশব কৈশোর।

আমার দাদুর বাড়ী চিকনমাটি গ্রামের 'ধনী পাড়ায়'। এটি ডোমার থানার অন্তর্গত। সেকালে উপজেলা বলে কোন ধারনা ছিল না। আমাদের মহকুমা ছিল নীলফামারী। আর জেলা ছিল রংপুর। এখন ডোমার পৌর উপজেলা। নীলফামারী আমাদের নতুন জেলা। বুঝবার বয়স হলে চিকনমাটির কথা অনেক শুনেছি লোকমুখে। এই চিকনমাটির আবার আছে পুর্ব ও পশ্চিম অংশ। পূর্ব ও পশ্চিমে মধ্যে ছিল চিরকালিন প্রভাব ও প্রতিপত্তির প্রতিযোগিতা। কখনও মৃদু সংঘাত। থানাটির ভৌগলিক পরিসরে ছিল আরও নানান বসতি ভিত্তিক নাম। যেমন বসতপাড়া, তেলিপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, চান্দিনাপাড়া, ডাবুরি, দোলাপাড়া, সাহাপাড়া, কাঙ্গালটাড়ী, বোড়াগাড়ী।এগুলি সবই এখন পৌর এলাকার ভেতরে। প্রভাব ও প্রতিপত্তির পালাবদল ও হাত বদল হয়েছে সময়ে। এর কিছুটা অহমিকা ও আয়েসের বিপর্যয়ে আবার কিছুটা অপেক্ষাকৃত ভাগ্য উন্নত পরিশ্রমী প্রতিযোগিদের কর্মোদ্যোগের সুফল হিসেবে।

স্বরনকালিন অতীত থেকে ডোমারের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল রেলগাড়ী। যাত্রীবাহী মালবাহী উভয়ই। কলকাতা মেল যশোর খুলনা হয়ে বড়লাইনের বা ব্রডগেজের রেলে ডোমারের উপর দিয়ে চলে যেতো জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি তারপর দার্জিলিং। বৃটিশ ভারতে ডোমারে ছিল র‍্যালি ব্রাদার্সের পাটের ব্যবসা। এ অঞ্চলের পাটের উৎপাদন ছিল বিলাতের ডান্ডির পাটকলের রসদ। মাড়োয়াড়ীদের ছিল বিশাল বিশাল জুট প্রেস, আড়ত আর পাটের গুদাম। তামাক ও ধানের উৎপাদনও হত বানিজ্যিক ভিত্তিতে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ফড়িয়ারা কিনে নিত পাট। জমা হত ঐসব আড়তে। তারপর গরু আর মহিষের গাড়ীতে পৌঁছাত স্টেশনের গুদামে। রাস্তাগুলো পাকা ছিল না তখন। শুধু রেলি ব্রাদার্স থেকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত রাস্তা ছিল পাথর বিছানো। ভারী গাড়ীর চাকা বর্ষাকালে কাদায় আটকে গেলে এক মহা কান্ড ঘটতো বাজারের রাস্তায়। শ্রমিক ও গাড়োয়ানরা মচাতো উচ্চরব শোর। কেউ লেগে যেতো লোহার বেড়ী দেয়া কাঠের চাকা ঠেলতে আর গাড়োয়ান পেচিয়ে ধরতো লেজ খুব জোরে তারপর চামড়ায় চিকন রশির মতো বাশের চিকন লাঠির একপ্রান্তে বাঁধা 'পেঠি' (চাবুকের স্থানীয় সংস্করন) দিয়ে ক্রমাগত মারতো সেই নির্বাক নিরিহ পশুগুলোকে। জয়নুলের সেই গরুর গাড়ীর গরুগুলির মত, শক্ত হয়ে উঠত পশুগুলোর সারা শরীর। চোখ হয়ে যেতো বড় আর গোল লাল। অস্থির হয়ে উঠতো ওদের নিরিহ প্রাণ। লাল জামা আর লুঙ্গি পরা গামছা মাথায় পেচানো, কুলির বহর সেখান থেকে তুলে দিত গুডস্ ট্রেনে। তারপর চলে যেত দূর-দূরান্তে। সুর্যোদয় থেকে সুর্যাস্ত পর্য্যন্ত কৃষক ও শ্রমিকের জীবন ছিল এরকম প্রাণবন্ত ও কর্মচঞ্চল।

পাকিস্তানী আমলেও চালু ছিল এই বানিজ্য। ইংরেজদের হাত বদলে তা পৌঁছেছিল পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুদের হাতে। এই পাটের অর্থেই গড়ে উঠেছিল ধুসর মরুভুমির বুকে নতুন

রাজধানী ইসলামাবাদ। পাকিস্তানীদের জাতীয় আয়ের স্বার্থপর ব্যবহার থেকেই অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রণিত হয় ৬ দফার ঐতিহাসিক দাবী যা পরে নির্বাচনে পায় নিরংকুশ রায় এবং পরে আসে স্বাধীনতা।

দেওয়ানগঞ্জ আর হলদিবাড়ী কুচবিহার জেলায় মধ্যে হলেও জলপাইগুড়ি জেলা শহর মাত্র ১৬ কিলোমিটার দুরত্বে। জলপাইগুড়িকে বলা হয়ে থাকে ‘ দ্বিতীয় কলকাতা।’ পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চলের এখনও একটি প্রধান শহর। অখন্ড বাংলায়ও জলপাইগুড়ির মর্য্যাদা একই ছিল। এদিকে আমাদের এলাকা ডোমার রংপুর জেলার অন্তর্গত থাকলেও রেল পথের দুরত্বে ছিল জলপাইগুড়ির সহজ নিকটে। কারন ডোমার থেকে রংপুর অথবা দিনাজপুর, যেতে হলে বড় লাইনে প্রথমে যেতে হত তখনকার প্রসিদ্ধ রেল জংশন স্টেশন পার্বতীপুর। সেখানে ট্রেন বদলিয়ে ছোট লাইনে অনেক ঘুরে যেতে হত রংপুর্।রংপুর হয়ে ঢাকা যেতে তখন লাগতো প্রায় দেড় দিন। ছোট লাইনে প্রথমে যমুনার এপারে বাহাদুরা ঘাট। তারপর ফেরীতে যমুনা পারাপারে কেটে যেতো প্রায় একটা দিন। মানুষ যাত্রী, বাস, মোটর গাড়ী, মাল বোঝাই ট্রাক, সবই পারাপার হত এই ফেরীতে ভেসে। ফেরীতে উঠানো নামানো ছির বিপদজনক ও লাগতো অনেক সময়। তারপর ফেরী যমুনায় ভেসে চলতো কয়েক ঘন্টা তিস্তামুখ ঘাটের দিকে। শীতের শীর্ণ নদীতে চরে আটকে পড়ার ভয়ে ফেরী নিতো দীর্ঘপথ। আবার বর্ষায় ভরা নদীতে নদীর দুকুল প্লাবিত হয়ে ঘাটগুলো যেতো অনেক দুরে সরে। এর মানে রংপুর বা ঢাকার সাথে আমাদের অঞ্চলের মানুষের ভৌগলিক যোগাযোগ ছিল খুবই দুর্গম। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি বা কলকাতা যাওয়া যেতো খুব সহজেই একটি মাত্র রেলে চেপে সরাসরি এবং কম সময়ে। আমার দাদুরা ঈদ পার্বনে বাজার ঘাট করতে, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্যে নিয়মিত জলপাইগুড়ি যেতেন। কখনও বা কলকাতায়। ঢাকা, রংপুর ছিল অচেনা অজানা। শুধু মাত্র কোর্ট কাচারীর জন্য মানুষদের বাধ্য হয়ে যেতে হত কদাচিৎ। বাকি অংশ আগামী সংখ্যায় পড়ুন - - - -

---

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া

ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত এ লেখাটি চলবে - - - -